যুগান্তর

31 JUL 2013

তারিখ ..... পৃষ্ঠা ... 31 JUL 2013 .....

এ কে এম শাহনাওয়াজ

বন্ধ হোক শিক্ষক রাজনীতির নোংরা খেলা

বেশ কিছুদিন ধরে শিক্ষক সমিতির ব্যানারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের একাংশ উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন করে যাচ্ছিলেন। তারা মাস তিনেক আগে কয়েকটি দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামেন। একজন নির্বাচিত উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি করার মতো চূড়ান্ত আন্দোলনে নামার জন্য যে পর্যায়ক্রমিক ধাপ অতিক্রম করতে হয়— অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থন বা দাবি পূরণের মতো সময় দিতে হয়, সে পথে না গিয়ে মনের একমাত্র ইচ্ছেটি তারা খুব দ্রুত প্রকাশ করে ফেলেন। সময় সৃষ্টির অনেকটা আগেই একজন নির্বাচিত ভিসির পদত্যাগ দাবিও করেন। উল্লেখ্য, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের দৃশ্যমান দাবিগুলো খুব একটা শিক্ষার্থী স্বার্থসংশ্লিষ্ট অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা-সংক্রান্ত ছিল না। ছিল না ভিসির নৈতিক স্খলন বা আর্থনৈতিক দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ। ছিল একান্তই ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থসংশ্লিষ্ট। প্রকাশ্য দাবিগুলোর মধ্যে কিছু ছিল খুবই আপেক্ষিক। অর্থাৎ ভিসি কার সঙ্গে কথা বলার সময় পদ চান করেছিলেন, যা খুব বাঞ্ছিত মনে হয়নি। মিডিয়ার সামনে এমন সব কথা বলেছেন, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছোট করা হয়েছে (যদিও অভিযোগের সময় এসব প্রাসঙ্গিক করা হয়নি)। ভিসি সুযোগ পেলেই নাকি নির্বিচারে অনেককে জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মন্তব্য করেন। অবশ্য কোনো কোনো দাবিতে সুনির্দিষ্ট অভিযোগও ছিল। উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের এবং শিক্ষক লাঞ্ছনাকারী ছাত্রের বিচার না করা ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে অবশ্য পরবর্তী সময়ে প্রশাসন থেকে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, উল্লিখিত ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যথাসময়ে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। কমিটির বেশিরভাগ সদস্য হিসেবে আছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরাই। এর পরবর্তী প্রক্রিয়ায় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ না করার ক্ষেত্রে উপাচার্যের ভূমিকা খুবই কম। কারণ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটি, সিন্ডিকেট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিচারের রায় কার্যকর করা হয়। উপাচার্য মহোদয় এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছেন এমন শোনা যায়নি। এছাড়া আরও দুটি অভিযোগ যুক্ত হয়েছিল। যার ভেতরে অন্তত শিক্ষক সমিতির নামে জারি করা লিফলেটে আন্দোলনকারী শিক্ষকরা ভিসি মহোদয়ের দুর্নীতির সূত্র পেয়েছেন বলে মনে হয়েছিল। একটিতে বলা হয়েছে, 'একজন অযোগ্য প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের চেষ্টা'। এর কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। প্রকৃত তথ্য গোপন করে বিকৃত হতে হয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে ডার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপক পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য একজন আবেদন করেছিলেন। প্রার্থীর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে জার্নালিজম ছিল না। তবে মিডিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি জার্নালিজম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি করেছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়। ভিসিসহ মোট সাতজন সদস্যের সবাই প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করেন। তবে বেসিক ডিগ্রি জার্নালিজম না থাকায় অধ্যাপক পদের বদলে সহযোগী অধ্যাপক পদে সুপারিশ করা হয়। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে ভিসিকে অভিযুক্ত করার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। উপরন্তু শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এই নিয়োগের বিরোধিতা করায় উপাচার্য মহোদয় বিষয়টি সিন্ডিকেটে না তুলে স্থগিত রেখেছেন।

এতসব ভেতরের কথা আড়াল করে লিফলেটে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে আন্দোলনকারীদের অসততা বলে, মন্তব্য করেছেন ক্যাম্পাসবাসী অনেকে। একই ধারায় আরেকটি অভিযোগ ছিল, দু'জন অযুক্তিযোদ্ধার ছেলেমেয়েকে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভিসি মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি করেছেন। প্রশাসনিক ব্যাখ্যায় দেখা গেল, এখানেও প্রকৃত সত্য আড়াল করা হয়েছে। প্রথমত, মুক্তিযোদ্ধা কোটার বিপরীতে এদের ভর্তি করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, ভিসির একক ক্ষমতায় নয়, কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সুপারিশে এদের ভর্তি করা হয়েছে। তৃতীয়ত, এদের ভর্তি করা হয়েছে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীর অনুরোধে। ভর্তিকৃতদের একজনের বাবা ক্যাম্পাসে রিকশা চালিয়ে মেয়েকে শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখেছেন, আর অন্য ছাত্রের মা ক্যাম্পাসে পিঠা বিক্রি করে সংসার চালান। এসব সত্য সামনে এলে অভিযোগ দুর্বল হয়ে যায় বলে লিফলেট থেকে সযত্নে তা সরিয়ে রাখা হয়েছে। এ কারণে আমাদের মনে হয়, গোষ্ঠীস্বার্থ ও বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এমন দুর্বল ইস্যুর আন্দোলন সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তাই সুনির্দিষ্ট দুটি শিক্ষক গ্রুপ ছাড়া সাধারণ শিক্ষক এবং অন্যান্য দলীয় গ্রুপের শিক্ষকরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হননি। যুক্ত হয়নি সাধারণ ছাত্রছাত্রী বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী শিক্ষার্থীরাও।

ছাত্র-শিক্ষকের সমন্বিত আন্দোলনের মুখে এক বছরের কিছুটা আগে ভিসি শরিফ এনামুল কবীরকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অনেক অনৈতিকতা ও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। এ জন্য সে সময়ের আন্দোলন ছিল সর্বাত্মক। সেই থেকে তার দল কষ্ট ভুলতে পারেনি। প্রতিশোধস্পৃহা থেকে এই দলটি এবারের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করে বলে অধিকাংশ ক্যাম্পাসবাসীর বিশ্বাস। কথিত আছে নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে বিদায়ী ভিসি দুই শতাধিক শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন। এই কৃতজ্ঞ শিক্ষকদের একটি অংশ বর্তমান আন্দোলনের চালিকা শক্তি। বর্তমান ভিসির কাছ থেকে বড় বড় প্রশাসনিক পদ পাওয়ার অপ্রাপ্তি দু'-চারজন পদবঞ্চিত বৃদ্ধ অধ্যাপক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন বলে ক্যাম্পাসে বেশ প্রচারণা হয়েছে। এছাড়া বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের একটি অংশ এই আন্দোলনে শক্তি জোগাচ্ছে। এ ধারার একজন সহকর্মীর কাছে আমি এমন নিশ্চুপ আন্দোলনে বিএনপির জড়ানোর কারণ জানতে চেয়েছিলাম। তিনি দুটি কারণ নির্দিষ্ট করলেন। একটি বিএনপি শিক্ষক গ্রুপের নেতৃস্থানীয় কোনো কোনো শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা ড. আনোয়ার হোসেনকে ভিসি হিসেবে সহ্য করতে পারছেন না। তাই অনুসারীদের সবুজ সংকেত দিয়েছেন আন্দোলনে জড়াতে। আর দ্বিতীয় কারণটির সঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি জড়িত। বিএনপি সমর্থিত শিক্ষকদের বিশ্বাস, আসন্ন নির্বাচনের পথ ধরে বিএনপি সরকার গঠন করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সরকারবিরোধী আন্দোলনের নামান্তর। সুতরাং এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সামনের সারিতে থাকতে পারলে বেগম খালেদা জিয়ার গুডবুকে থাকা যাবে। ফলে সময় এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হওয়া সহজ হবে।

জাহাঙ্গীরনগর 'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার' ভিসিকে তাড়ানোটা প্রধান লক্ষ্য বলে নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনে মাঠ গরম করার আগেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিলের জন্য সিদ্ধি করে ফেললেন শিক্ষার্থীদের। ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে যা ঘটেনি সেই আচরণ করা হল। সিন্ডিকেটরের আচরণে ক্লাসরুমে তালা লাগালেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। কিন্তু শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত ছিল ক্লাস করতে। এ পর্যায়ে বিযুক্ত কোনো কোনো দায়িত্বশীল শিক্ষক তালা খুলিয়ে ক্লাস নিলেন। কেউবা উন্মুক্ত মাঠে ক্লাস নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করলেন। কিন্তু সব কোর্সের ক্লাস একই সঙ্গে শেষ না হলে তো সেশন জটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের আর্তি আন্দোলনকারী শিক্ষকদের কানে পৌঁছাল না।

ক্লাস বর্জন করে ছাত্র-শিক্ষকদের চলার মুখে পড়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। তাই ছুটির পর তড়িঘড়ি করে জানিয়ে দিলেন, 'শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে তারা ক্লাসে ফিরে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় আন্দোলন বেগবান করতে ব্যর্থতার মতো দুর্বল ইস্যুর ওপর দাঁড়িয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন। যেসব শব্দ প্রয়োগ শিক্ষকদের মানায় না, তেমন শব্দ ব্যানারে লিখে ভিসি ড. আনোয়ার হোসেনকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে প্রশাসনিক ভবনে তালা মেরে পাহারায় বসে গেলেন আন্দোলনকারী শিক্ষকদের কেউ কেউ। এ আচরণ কতটা বেআইনি হল, তা তারা বিচার করলেন না। তারা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলেন ভিসিকে। কিন্তু সিন্ডিকেটরের মুখে প্রায় দেড় মাস কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারলেন না দু'জন প্রোভিসি, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রার এবং অফিসারসহ শতাধিক কর্মচারী। এতে অবশ্য প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ করানো সম্ভব হয়নি। ভিসির বাসভবনের কার্যালয় থেকে জরুরি কাজ চলতে থাকে। ফলে আন্দোলনকারীরা আশা করে ফেলতে পারেননি ক্যাম্পাস। কিন্তু প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলায় অনুষ্ঠিত হতে পারেনি সিনেট অধিবেশন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পাস করানো যায়নি। একাডেমিক কাউন্সিল বসতে না পারায় এবং সিন্ডিকেট সভা না হওয়ায় গবেষক, ছাত্র ও শিক্ষকদের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঝুলে আছে।

এ অযৌক্তিক আন্দোলন এক সময় সচেতন শিক্ষক ও ছাত্রদের খুব করে তোলে। কারণ শিক্ষক সমিতির নামে হলেও ৬০০ শিক্ষকের এই সমিতির সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতেন ১৫০ থেকে পৌনে ২০০ শিক্ষক। অদ্ভুতভাবে নিয়ম করা আছে, শিক্ষকদের এক-তৃতীয়াংশ নয়, মাত্র ৪৫ জন শিক্ষক উপস্থিত থাকলেই কোরাম হবে। উপস্থিত শিক্ষকদের অধিকাংশ দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাদের মধ্যে যারা ভিন্নমত পোষণ করে বক্তব্য রাখতেন, অভিযোগ আছে তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হতো না। অবশেষে বাম ঘরানার শিক্ষকরা এমন অযৌক্তিক স্বার্থবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। সাধারণ সভায় আলোচিত হয়নি এমন বিষয়কে সমিতির সিদ্ধান্ত বলে চালিয়ে দেয়ার গুরুতর অভিযোগ এনে শিক্ষক সমিতির চারজন নির্বাহী সদস্য লিফলেটে সব তুলে ধরেন। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সেমিনারে এবং মিডিয়ার কাছে তাদের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত করা শিক্ষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকে।

আন্দোলনকারীরা এতটা অনমনীয় থাকেন যে, শেষ পর্যন্ত ছাত্র ও শিক্ষক মিলে চারজন আদালতে প্রতিকার চেয়ে দায়ের করেন রিট। অবশেষে বিজ্ঞ আদালত এ ধারার আন্দোলনকে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন বলে বর্ণনা করেন। এই সূত্রে প্রশাসনিক ভবন দখলমুক্ত করে স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। এভাবেই সিন্ডিকেটরের হাত থেকে মুক্ত হল প্রশাসনিক ভবন।

তবে আন্দোলনকারী শিক্ষক নেতারা এখনও বেশ জোরালো বক্তব্য রাখছেন। হাইকোর্টের আদেশের মেয়াদ শেষ হলে আবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুমকি দিচ্ছেন। আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তচিন্তা চর্চার আঙিনা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা ও অধিকার আদায়ের আন্দোলন তো এ মাটিতেই হবে। কিন্তু প্রতিবাদ করার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে কোনো পক্ষ যদি গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিলের জন্য আন্দোলনের নামে কালিমা লেপন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন পরিবার চায় না, নষ্ট রাজনীতির ধূপ্রভাব তমসাবৃত করে ফেলুক বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনকে। আমরা আশা করব, বৃহত্তর স্বার্থ এবং শিক্ষকতার আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের সহকর্মীরাও ফিরে আসবেন যুক্তির আলোয়। সব যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না— এটাই নিয়ম। গোষ্ঠী ও দলীয় স্বার্থে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কল্যাণ ও শিক্ষা-গবেষণার পথ সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা যাতে শক্তি সঞ্চিত রাখতে পারি, সব পক্ষের কাছে এটিই আমাদের বিনীত চাওয়া।

> ছাত্র-শিক্ষকের সমন্বিত আন্দোলনের মুখে এক বছরের কিছুটা আগে ভিসি শরিফ এনামুল কবীরকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অনেক অনৈতিকতা ও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। এ জন্য সে সময়ের আন্দোলন ছিল সর্বাত্মক। সেই থেকে তার দল কষ্ট ভুলতে পারেনি। প্রতিশোধস্পৃহা থেকে এই দলটি এবারের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করে বলে অধিকাংশ ক্যাম্পাসবাসীর বিশ্বাস।

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
shahnawaz7b@gmail.com